Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভবিষ্যতের কবিতা (রামেশ্বর শ' অনূদিত)

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জীনাত ইমতিয়াজ আলী
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.11
Pages	237-246
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীঅরবিন্দ॥ ভবিষ্যতের কবিতা (রামেশ্বর শ' অনূদিত)॥ প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, নভেম্বর ১৯৯৫॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০+০১-৪৩০॥ মূল্য: ১১০ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) সাধারণ্যে রাজনীতিবিদ ও অধ্যাত্মতত্ত্ব চেতনায় নিমগ্ন কোনো সাত্ত্বিক ব্যক্তিরূপেই পরিচিত। বলা যায়, দ্বিতীয় পরিচয়েই তিনি কালান্তরে সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ পরিচয় তাঁর আকৈশোর অন্বিষ্ট ছিল না। উত্তাল যৌবনে তিনি নিজেকে সংলগ্ন করতে চেয়েছিলেন ঔপনিবেশক শক্তির সঙ্গে। তাদেরই শোষণবাদী শাসনযন্ত্রের সহোযোগী হওয়ার জন্যে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন আই সি এস পরীক্ষায়। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস এই কৃতী তরুণ সাফল্য লাভ করেছিলেন সহজেই। কিন্তু চূড়ান্ত অভিষেকের উত্তরীয় তিনি স্পর্শ করেননি। বলা যায়, তা তিনি চাননি। অশ্বচালনা পরীক্ষা গ্রহণকালে তাঁর স্বনির্বাচিত অনুপস্থিতিই তাঁকে করেছে উৎকেন্দ্রিক (অঞ্জলি বসু; ১৯৮৮ : ৩৪)। অতঃপর প্রবাস-জীবনের পরিসমাপ্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সেই সঙ্গে সূচনা হয় কর্মজীবনের; তাঁর আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশ অন্বেষার।

অরবিন্দের দ্বিতীয় পর্বের জীবন বর্ণবহুল, কর্মসফল, বৈচিত্র্যময় এবং বিপৎসংকুল। বরদা কলেজের অধ্যাপনার আপাত নিরাপদ ও মধ্যবিত্তের গৃহনিষ্ঠ জীবন যাপনের পরিচিত ও পুনরাবৃত্ত মডেল ত্যাগ করে তিনি দীক্ষিত হয়েছেন বিপ্লবী চেতনায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী 'ঠাকুর সাহেব'-ই ছিলেন অরবিন্দে নতুন জীবনাদর্শের ও জীবনার্থের তটভূমে পুনর্বাসিত হওয়ার নেপথ্য নায়ক; অন্য কথায়, অরবিন্দের মানস-নির্মিতির শুশ্রূষাকারী প্রতিভা।

অরবিন্দের জীবনে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। সহোদর বারীন্দ্রকুমারকে স্বাদেশিক বোধে পরিস্নাত ও বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টিতে সাহায্যের লক্ষ্যে অরবিন্দ ফিরে আসেন তাঁর জন্মস্থান কলকাতায়। ১৯০৫ সনে বাংলাদেশ হয় বিভাজিত। ভারতীয় কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে অরবিন্দও পূর্ববঙ্গের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাননি। এ-ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্টতই প্রতিপক্ষের।

১৯০৮ সন থেকে অরবিন্দের জীবন পূর্বের তুলনায় আরো বিস্তৃত ও বৃহৎ পরিসরে সংস্থাপিত হতে থাকে। বিপ্লবী কর্মতৎপরতার পাশাপাশি কখনো পত্রিকা-

সম্পাদক, কখনো লেখক হিসেবে তিনি জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে ঐকান্তিক ও সনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত রাজনীতি তিনি পরিত্যাগ করেন ও অভিনিবিষ্ট হন অধ্যাত্মসাধনায় এবং এই অন্তর্লীন প্রেরণাই তাঁকে উৎসাহিত করেছিল পন্ডিচেরির আশ্রম প্রতিষ্ঠায়।

লেখক ও সম্পাদক হিসেবে অরবিন্দ *বন্দেমাতরম, কর্মযোগিন, ধর্ম, এরিয়া, সন্ধ্যা, যুগান্তর, মাদার ইন্ডিয়া* প্রভৃতি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এ-সূত্রেই রচিত হয়েছে তাঁর আটত্রিশটি গ্রন্থ: বাংলা ছয়টি ও ইংরেজি বত্রিশটি। এ ছাড়াও তাঁর পত্রের দুটি সংকলনগ্রন্থ রয়েছে।

এরিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম *দি ফিউচার পোয়েট্রি*। ডিসেম্বর ১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯২০ কাল-পরিসরে ধারাবাহিকভাবে মোট বত্রিশটি সংখ্যায় রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। *দি ফিউচার পোয়েট্রি* রচনার একটি পুরোভূমি বর্তমান (দ্র. রামেশ্বর শ'; ১৯৯৫ : ৩৭৯) :

> ...অধ্যায়গুলি লেখা শুরু হয় জেম্‌স্ এইচ্ কাজিন্সের (James H. Cousins) লেখা একটি বই 'New Ways of English Literature'-কে ... উপলক্ষ করে। এই বইটির এক কপি শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠানো হয়েছিল 'আর্য' পত্রিকার প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই তাতে সমালোচনার জন্যে। তিনি এর একটি সমালোচনা শুরুও করেছিলেন...; কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি এই সমালোচনা লেখার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কারণ তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি শিল্প ও জীবন সম্পর্কে নিজের ধ্যানধারণা ও ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা নিজের মতামতগুলি সুপরিণতভাবে প্রকাশ করবেন।

সে-অর্থে অরবিন্দের জীবন-জিজ্ঞাসা, তাঁর তত্ত্বভাবনা ও ধর্মচেতনার স্বাক্ষর *দি ফিউচার পোয়েট্রি*। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৩ সনে তাঁর মৃত্যুর (১৯৫০) তিনি বছর পর পন্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। অতঃপর ১৯৭১ সনে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ বার্থ স্যান্টেনারি লাইব্রেরির নবম খণ্ডে প্রকাশিত অরবিন্দ রচনাবলীর রাজসংস্করণের শেষ খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সনে প্রকাশ পায় *দি ফিউচার পোয়েট্রি*-র দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণেরই বাংলা অনুবাদ (*ভবিষ্যতের কবিতা*) করেছেন রামেশ্বর শ'।

২

অনুবাদককে দুটি বিষয়ের প্রতি সব সময়ই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে এ দুইয়ের একটি *উৎস ভাষা* অর্থাৎ, মূল পাঠ যে-ভাষায় রচিত সেই বিশেষ

ও সুনির্ধারিত ভাষা; এবং অন্যটি *অন্বিষ্ট ভাষা* অর্থাৎ, কোন ভাষায় অনুবাদের জন্যে অনুবাদক প্রতিজ্ঞাদীপ্ত সেই ভাষা (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

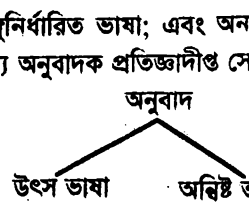

মনে হতে পারে, দ্বিভাষা-জ্ঞানী কিংবা *বহুভাষী* কোনো প্রতিভাই অনুবাদের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু সে-বোধ একবারে সরল সত্য। কেননা অনুবাদকের কেবল উৎস ভাষা-জ্ঞান থাকলে চলে না; সেই ভাষিক পাঠ যে-বোধ, নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মানবিক আবেগ বয়ে আনে, সে-সব সম্পর্কেও তাঁর স্বচ্ছ ও গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্বিষ্ট ভাষা সম্পর্কেও অনুবাদকের সমান সচেতনতা আবশ্যক। মাতৃভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে স্মরণে রাখতে হয় যে, তাঁর আরাধ্য কর্ম যেন যান্ত্রিক না হয়; সহজে উচ্চার্য ও সবার বোধগম্য অনুবাদই অভিপ্রেত সুফল বয়ে আনে। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ এ ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে। কেননা ভাষিক সংগঠনের তুলনায় পাঠের যাথার্থ রক্ষাই এখানে অনুবাদকের মৌল দায়িত্ব। কিন্তু উৎস ভাষা বিষয়ক তাঁর আত্যন্তিক বোধই এ প্রতিকূলতা সহজেই দূর করতে পারে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে এ সত্যও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল ভাষান্তরের মধ্যে তা সীমায়িত নয়। সে-পরিধি বহুধাবিভক্ত ও স্তরপরম্পরা-অশ্রয়ী। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৌদ্ধিক স্তরও ইতোমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত (দ্র. Crystal; 1987 : 344)। যেমন :

[এক] *আক্ষরিক অনুবাদ*। উৎস ভাষার প্রতিটি *সিলেবল* ও *ধ্বনিমূলকে* অন্বিষ্ট ভাষায় স্থানান্তর করার ধারণা থেকে অনুবাদ-সম্পর্কিত এ-বোধের সৃষ্টি। এ জাতীয় অনুবাদ কখনোই অর্থবহ হয়ে ওঠে না। তাছাড়া উৎস ভাষার বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন অন্বিষ্ট ভাষায় *সংজ্ঞাপন* করার কোনো উপায় এতে থাকে না। আক্ষরিক অনুবাদ তাই শেষপর্যন্ত পরিণত হয় পণ্ডশ্রমে।

[দুই] *প্রতিশাব্দিক অনুবাদ*। উৎস ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠনগুচ্ছের মাধ্যমে নিষ্কাসিত পাঠ এ অনুবাদ-চিন্তনে সবিশেষ প্রাধান্য পায়। অনুবাদক অতঃপর অন্বিষ্ট ভাষায় এবং সেই ভাষা সংগঠন-সূত্রের অনুসরণে শব্দ-সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন পাঠ পুনর্নির্মাণ করেন। সৃষ্টিকর্ম হিসেবে এ অনুবাদ পূর্বাপেক্ষা সফল হলেও উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় না।

[তিন] *স্বাধীন অনুবাদ*। এ জাতীয় অনুবাদে উৎস ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ততো গুরুত্ব পায় না। অনুবাদক অনেকটাই তাঁর বৌদ্ধিক স্বায়ত্তশাসনের

দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্বিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ধরনের অনুবাদ প্রায়শই স্বাধীন অনুসৃতি বলে গণ্য হয়।

অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য উৎস ও অন্বিষ্ট ভাষার মধ্যে *আর্থ সমতা* রক্ষা করা। বলা যায়, এই মৌল প্রবণতার কারণেই অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক কর্মে (যেমন, সারাংশ লিখন, পত্র-রচনা ইত্যাদিতে) নিয়োজিত ব্যক্তি থেকে অনুবাদক স্বতন্ত্র। আর্থ সমতা রক্ষাও সহজসাধ্য কোনো বিষয় নয়, বরং তা সম্পূর্ণ বিপরীত, বহু সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম সমস্যায় আকীর্ণ। কেননা কী পরিমাণ আর্থ সমতা বাঞ্ছনীয় ও গ্রহণীয় সে-সম্পর্কিত কোনো প্রত্নমান সুনির্ধারিত নেই। উৎস ও অন্বিষ্টের মধ্যে এক : এক (১ : ১) আর্থ সমতা রক্ষাও সম্ভবপর নয়; এমন কি ইন্টার লিংগুয়াল বা একই ভাষার মধ্যে অনুবাদেও তা দুঃসাধ্য (দ্র. Jacobson; 1966 : 232-34)। অনুবাদ তাই সব সময়ই এক কুহেলীকলুষ অভিধা। অনুবাদকের সাফল্য তাঁর উদ্দেশ্য ও পাঠক সাধারণ্যে অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল।

৩

রামেশ্বর শ' অনূদিত *ভবিষ্যতের কবিতা* পরিশিষ্ট বাদে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত: পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ। এ বিভাজন একান্তই বিষয়াশ্রয়ী ও সুচিন্তিত। পূর্বার্ধ গ্রন্থ পরিকল্পনার ভূমিকা বা পরিপ্রেক্ষিত রূপেই গ্রহণীয়। অরবিন্দ এ অংশে তাঁর কাব্যচিন্তন ও কাব্যাদর্শের পরিচয় উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে, কবিতা মানসিক বিষয় হলেও তাতে শ্রুত হয় দূরাগতের আহ্বান। কবিতাকে তাই তিনি মন্ত্র-রূপে গ্রহণ করতে চান। তাঁর বিবেচনায়, কাব্য রচনা মূলত 'কাব্যের একটি ক্রমবর্ধমান সান্নিধ্যের আবিষ্কার'। এ উৎসার ভারতীয় ঐতিহ্যেরই পুনঃকথন :

> বেদ বলেন, মন্ত্র অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্ উত্থিত হয় যুগপৎ ঋষির অন্তঃকরণ থেকে এবং সত্যের দূরতম পীঠস্থান থেকে। কাব্য আবিষ্কার করবে সেই বাক-কে, সেই দিব্যগতিকে, সত্যের উপযুক্ত সেই চিন্তারূপকে।

কজিন্সের সমালোচনার মধ্যে অরবিন্দ তাঁর আচরিত আদর্শেরই প্রতিফলন দেখেছেন। ফলে কাজিন্সের *নিউ ওয়েজ ইন ইংলিশ লিটারেচার* তাঁর মনঃসংযোগ কেড়েছে। কিন্তু কাজিন্সের সব মন্তব্য অরবিন্দের সমর্থন পায়নি। শেক্সপিয়রকে কাজিন্স মহৎ কবি হিসেবেই বিবেচনা করতে চান। সে-ক্ষেত্রে অরবিন্দ সমগ্রতা বোধে আস্থাশীল। তিনি নাটকের পাশাপাশি শেক্সপিয়রে কাব্যসাহিত্যকেও সমান বিবেচনায় আগ্রহী :

> শ্রীযুক্ত কাজিন্স যখন আমাদের বলেন যে, শেক্সপীয়রের দৃষ্টিতে "তার নাট্যাংশ নয়, তার জীবনের সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে", তখন আমার মনে হয় তার নাট্যাংশ ও

কাব্যাংশের মধ্যে এই পার্থক্যরচনাটা সর্বত্র নির্ভুল নয়; তার মধ্যে একটা সত্য আছে ঠিকই, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

এ পর্বের দ্বিতীয় রচনা *কাব্যের আত্মা*-য় অরবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসায় বহু উচ্চারিত প্রশ্ন : কাব্যের আত্মা কোথায়-এর মুখোমুখি হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত চিরায়ত সাহিত্য-মূল্যায়নে দুটি পরম্পরা বিকশিত হয়েছিল— দেহবাদী ও আত্মাবাদী সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী মনে করতেন যে, কাব্যের আত্মা ব্যবচ্ছেদ করে পাওয়া যায় না; তা অনুসন্ধান করতে হয় দেহের অতীত কোনো ভুবনে। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও প্রথমোক্তদের বিপরীত। তাঁরা মনে করতেন, মহৎ কাব্যমাত্রেরই একটি দেহসুষুমা রয়েছে এবং সেই কায়াসৌকর্যই তার অপূর্বত্ব, কাব্যের আত্মা। অর্থ, ধ্বনি, অলংকার প্রভৃতি উপাচারে সজ্জিত কাব্যই কালাতিক্রমী অভিধা পায়। অরবিন্দ এই দ্বৈরথ ঐতিহ্যে লগ্ন হয়েও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। তাঁর মতে, কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এ শিল্পরূপের আত্মিক মূল্যে; আর কাব্যের শরীরী আয়োজন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় ও উপকরণমাত্র। প্রসঙ্গত তিনি গদ্যরীতিকেও তাঁর বিবেচনায় অর্ন্তভুত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্ট : 'গদ্য ... প্রকরণের ক্ষেত্রে আরো আকর্ষণীয় ছন্দঃসুষমার দিকে এগিয়ে' গেলে 'গদ্যশিল্পীরা তার নিজের স্বাভাবিক এলাকা ছাড়িয়ে কাব্য পরিধির দিকে পা বাড়ায়।'

ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ-এর আলোচ্য বিষয় শিল্পকর্মের সাম্য। অরবিন্দ এ জন্যে তিন ধরনের তীব্রতা: ছন্দোময় গতিপ্রবাহ, রচনাশৈলী ও অন্তরাত্মার সত্যানুসন্ধানের তীব্রতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ ত্রয়ী তীব্রতার অধিষ্ঠানই কবিকে পৌঁছে দেয় স্রষ্টার সমীপবর্তী আসনে; আর এর অন্যথা ঘটলে কাব্য হয় ক্ষতদষ্ট, এমনকি অনেক কালজয়ী কাব্যও এই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। অরবিন্দের বিবেচনায়, কবি হিসেবে মিল্টরে প্রবাদপ্রতিম সাফল্য সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টিজগতে অপূর্ণতা লক্ষণীয়। অমিত্রাক্ষের ছন্দের মাধ্যমে মিল্টন তাঁর অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের তীব্রতা সৃষ্টি করতে পারেননি। হুইটম্যান ও কার্পেন্টরের সীমাবদ্ধতার মূলে আছে ছন্দোময় গতিপ্রবাহের তীব্রতার অভাব এবং একই অসাম্য লক্ষ করা যায় ভিক্টোরীয় কবিদের ক্ষেত্রেও।

রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন মূলত কবিভাষার উপর। তাঁর মতে, কাব্যভাষা ও কাব্যবিষয় অভিন্ন। কবির মুখ্য দায়িত্ব রঙে-রূপে-বৈচিত্র্যে প্রকাশিত প্রকৃতির মতোই নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা। ফলে অনুভূতি শিখরস্পর্শী, আত্ম-উপলব্ধি পূর্ণ ও সমগ্র না হলে কবিতার শৈলীও পরিপক্বতা পায় না।

কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র-এ আলোচিত হয়েছে কবির জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য। অরবিন্দ সূক্ষ্মদর্শনকেই কবির নিজস্ব ও বিশিষ্ট শক্তি বলেছেন। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির পার্থক্যও এই সূক্ষ্মদর্শনজাত উপলব্ধির। দার্শনিক জগৎ ও জীবনকে বিচার করেন 'প্রকৃতিদত্ত স্বরূপ–ধর্ম'-এর আলোকে; আর বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করেন তাঁর বিশ্লেষণী চেতনার সাহায্যে। কিন্তু কবির সূক্ষ্মদর্শনে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি সমীকৃত হয়ে অবস্থান করে বলে প্রতিভা হিসেবে কবিই শ্রেষ্ঠ এবং সব মহৎ কবিই যুগপৎ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।

জাতীয় কাব্য রচনার জন্যে একটি বিশেষ সময় ও আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাল-তারিখ গণনার মাধ্যমে জাতির অভ্যুদয়-পর্ব নির্দেশ করা যায় ঠিকই; কিন্তু এই বিশেষ শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অনেক সময় জাতীয় কাব্য রচিত হয় না। বস্তুত, এ কাজ তখনই সম্ভবপর হয়, যখন জাতির সব লোক না-হলেও অন্তত কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে অতীব অধ্যাত্ম-চেতনা ও আত্যন্তিক আত্মদর্শন জাগ্রত, শিকড়ায়িত ও বিকশিত হয়। এই বিরল সংখ্যক ব্যক্তিই জাতির আবির্ভাব মুহূর্ত ও পালাবদলের ইংগিত তাঁদের সৃষ্টিতে আভাসিত ও ব্যঞ্জিত করেন। *কাব্যের জাতীয় বিবর্তন* অংশে অরবিন্দ প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছেন।

আধুনিক ইংরেজ জাতির আবির্ভাব খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক বিচারে সে-পর্বের সূচনা ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসের যুদ্ধে নরম্যান্ডির ডিউক উইলিয়মের জয়লাভের মধ্য দিয়ে। তিনিই অ্যাংলো-স্যাকসন রাজা হ্যারল্ডকে পরাজিত এবং অতঃপর স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড বাদে সমগ্র ইংল্যান্ড অধিকার করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর হলেও সত্যি যে, শোণিত ও চেতনা—কোনো দিক থেকেই ইংল্যান্ডের প্রতি উইলিয়মের আত্মিক নৈকট্য ছিল না। ফরাশি সংস্কৃতি-পরিস্নাত উইলিয়ম ছিলেন এ চেতনারই উত্তরাধিকারী। ফলে রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি পূর্বের তুলনায় হয় অধিক প্রতিষ্ঠিত। উইলিয়ম রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োজিত অ্যাংলো-স্যাক্সনদের অপসারিত এবং ফারাশি ঐতিহ্যে প্রবুদ্ধ নরম্যানদের পুনর্বাসিত করেন। তাঁর এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত ও বিভাজিত করে (Wynne-Davies; 1990:01-02)। ইংল্যান্ড দৃশত ফরাশি, ইংরেজে ও কেল্টিক— এই ত্রিভাষী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই তিন ভাষা ব্যবহারকারীদের শ্রেণীচরিত্রগত ব্যবধানও ছিল প্রবল। অভিজাত ও রাজকর্মে নিয়োজিতরা ব্যবহার করতেন ফরাশি। অপেক্ষাকৃত অধ্বস্তন ও নিম্নবিত্তের জনসাধারণের ভাষা ছিল ইংরেজি; আর কেল্টিক-এর প্রচলন ছিল স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডে। এছাড়া করণিক সম্প্রদায়ের কর্মে ও গির্জায় ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের মতোই ব্যবহৃত হতো লাতিন।

উল্লেখযোগ্য যে, শাসন-ক্ষমতায় ও প্রশাসনিক কর্মে নরম্যান-ফরাশিদের পৌনঃপুনিক প্রাধান্য থাকার ফলে মূল ফরাশি দেশ ও সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ছিল ব্যাপক সংযোগ। কিন্তু সেই সখ্য ফরাশি রাজ-পরিবারের সঙ্গে ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত এভাবে অতিবাহিত হলেও ইংল্যান্ডের রাজ-পরিবারের আত্মপরিচয় সন্ধান অতঃপর অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাজা চতুর্থ হেনরি (১৩৯৯-১৪১৩) সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন। তিনি ফরাশি-র পরিবর্তে ইংরেজি-কে ইংল্যান্ডের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরই আনুকূল্য লাভ করেছিলেন কবি-ঔপন্যাসিক জিয়োফ্রে চসার (? ১৩৪০-১৪০০)। ইংরেজদের জাতীয় সাহিত্য রচনার সেই ঐতিহাসিক সূচনা। অতঃপর পাঁচ-শ বছরের উত্থান-পতন, ঐতিহাসিক ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ড হয়ে উঠেছে গ্রেট ব্রিটেন। এই দীর্ঘ সময় বহু প্রতিভা কখনো উপাখ্যান রচনা করে, কখনো কবিতা ও নাটক-প্রবন্ধের সাহায্যে, আবার কখনো উপন্যাস-গল্পের মধ্য দিয়ে ইংরেজ জাতির সামগ্রিক চৈতন্যপ্রবাহ উপস্থাপন করেছেন। ভবিষ্যতের কবিতা-র অবশিষ্ট রচনাগুচ্ছে অরবিন্দ ইংরেজ জাতির এই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই সযত্নে তুলে ধরেছেন। সে-অর্থে তাঁর দৃষ্টি প্রতীচ্যের দিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু এই পাশ্চাত্যমুখিতা কখনো বহিরাশ্রয়ী নয়। এ চেতনার গভীরে শিলীভূত রয়েছে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন। ফলে আমরা পরিচিত হই ইংরেজ ভাবাদর্শের পাশাপাশি কখনো ভারতবাসীর আবার কখনো সমগ্র ইয়োরোপের মানব জাতির অগ্রযাত্রার ইতিবৃত্তের সঙ্গে। এমন তুলনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক ও অধ্যাত্মচেতনা-পরিশ্রুত মূল্যায়ন সাধারণ কোনো প্রতিভার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্যে অরবিন্দের মতো সৃষ্টিশীল সত্তাই উপযুক্ত। *ভবিষ্যতের কবিতা* সে-অর্থে এক দুর্লভ সৃষ্টি।

৪

অনুবাদমাত্রই শ্রমসাধ্য কাজ। এক্ষেত্রে অনুবাদককে বেশকিছু কৃত্যসূচি নির্ধারণ করতে হয়। অন্বিষ্ট ভাষা-র পরিভাষা নির্মাণ, প্রকারসমূহ চিহ্নিত করা সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রামেশ্বর শ'-র অভিনিবেশ এ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবশ্যই। বাংলা পরিভাষার অপর্যাপ্ততা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে তাঁকে ইতোমধ্যে প্রচলিত পরিভাষার বাইরে বেশ কিছু নতুন পরিভাষা তৈরি করতে হয়েছে। তাঁর এ প্রচেষ্টার নির্বাচিত কিছু উদাহরণ নিচে দেখানো হলো :

chaos	নৈর্ঋতি
heightening	ভাবসমুন্নতি
ideal perfection	সব পেয়েছির দেশ

individuality	ব্যষ্টিচেতনা
inspiration	দিব্যপ্রেরণা
intuition	সংবোধি
long spaces	প্রলম্বিত যতি
penetrating intuitive spirit	অন্তর্ভেদী বোধিচেতনা
period of transition	উৎক্রান্তির পর্ব
psychic intuition	চৈত্যগত বোধিচেতনা
spirit within	অন্তর্বাসী আত্মা
temperament	মনোভাব
unanimist poet	অপ্রাণতাবাদী কবি

অনুবাদে পরিভাষা তৈরি ও প্রকারসমূহ অন্তর্ভুক্তির এ প্রক্রিয়া দুরূহ কর্ম হলেও দুঃসাধ্য কোনো বিষয় নয়। উৎস ও অন্বিষ্ট ভাষার রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও রীতিগত গভীর বোধসম্পন্ন অনুবাদক এ কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারেন। রামেশ্বর শ'-র জন্যে সুবিধা এই যে, তিনি ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক। উৎস ভাষা ছাড়াও অন্বিষ্ট, এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা-সম্পর্কেও তাঁর বিবেচনা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। ফলে তাঁর সৃষ্ট পরিভাষা ও নির্দেশিত প্রকারসমূহের মধ্যে কোনো দুরন্বয় দোষ নেই, রয়েছে সহজ সম্পর্ক। অন্বিষ্ট ভাষার ভাষাতত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি তা অনায়াসে নিষ্পন্ন করেছেন।

অনুবাদ-প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়, অনুবাদকের প্রেরণা-প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা কর্মমাত্রই প্রেষণা-সঞ্জাত। translator (T) বা অনুবাদক এই প্রেষণা-উদ্দীপিত হয়েই তাঁর উদ্দিষ্ট অনুবাদ কর্মটিকে প্রথমে code (C) বা *সংহিতা*-র বর্মে আবৃত্ত করেন। অতঃপর নিষ্পন্ন করতে হয় অন্যান্য কর্ম অর্থাৎ, author (A) বা লেখক কিংবা পাঠ নির্বাচন, অনুবাদক উৎস ভাষার যে message (M) বা বক্তব্য অন্বিষ্ট ভাষায় পৌঁছে দিতে চান তা নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে অনুবাদকের ভূমিকা দ্বৈত, তিনি উভয় ভাষারই receptor (R) বা গ্রাহক এবং প্রেরক। পুরো প্রক্রিয়া সূত্রের সাহায্যে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় (দ্র. Costa, 1989 : 308) :

$$\begin{array}{c} C_1 \qquad\qquad C_2 \\ A \rightarrow M_1 \rightarrow R_1/T/A_2 \rightarrow M_1 \rightarrow R_2 \end{array}$$

রামেশ্বর শ'-র ক্ষেত্রে আবেগগত প্রেরণাই সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনি নিজের মধ্যে যে অধ্যাত্ম চেতনাকে লালন করেছেন—অরবিন্দের রচনার মাধ্যমে তাঁর

সে-অনুভূতি আরো প্রতিপোষণ পেয়েছে। হতে পারে তিনি অরবিন্দের আদর্শে পরিস্নাত। কিন্তু মানস-নৈকট্যই সব সময় উৎকৃষ্ট অনুবাদের জনয়িত্রী হয় না। অনুবাদকের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ, তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রকাশ ক্ষমতার মৌলিকত্বই এ দুই সমধর্মী চৈতন্যের মধ্যে গ্রন্থি রচনা করে। অন্যভাবে, প্রচলিত প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলা যায়, শিষ্যের যোগ্যতাই গুরু নির্বাচন করে। অরবিন্দের রচনার অনুবাদকের জন্যে এ মন্তব্য সুপ্রযুক্ত। তিনি আন্তরিকভাবেই তাঁর প্রেষণাকে রূপবদ্ধ করেছেন। মূল পাঠের মতোই তাঁর অনূদিত পাঠ গম্ভীর ও বিষয়াশ্রয়ী। বক্তব্যের অনুগামী শব্দবন্ধের যে-রূপালেখ্য তিনি তৈরি করেছেন তা দ্বিতীয় পাঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে। আমরা অনুবাদকের নিষ্ঠার প্রশংসা করছি, গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

পরিশিষ্ট

১. আশ্রিত পরিভাষা

code	সংহিতা
communication	সংজ্ঞাপন
free translation	স্বাধীন অনুবাদ
idiom	বাগধারা
intellectual	বৌদ্ধিক
level	স্তর
literal translation	আক্ষরিক অনুবাদ
loss of information	তথ্য প্রক্ষেপণ
motif	প্রেষণা
phoneme	ধ্বনিমূল
register	প্রকার
semantic equivalence	আর্থ সমতা
source language	উৎস ভাষা
structure	সংগঠন
target language	অন্বিষ্ট ভাষা
terminology	পরিভাষা
text	পাঠ
word	শব্দ
word-for-word translation	প্রতিশাব্দিক অনুবাদ

২. সহায়ক গ্রন্থ/প্রবন্ধ

বাংলা

অঞ্জলি বসু (সম্পাদক)। ১৯৮৮। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ

রামেশ্বর শ' (অনূদিত)। ১৯৯৫। *ভবিষ্যতের কবিতা*, পণ্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

ইংরেজি

Costa, B.A., Silva Becher. 1989. Adding Variety of Translation: *Selected Articles from the English Teaching Forum* (1984-1988), Washington DC : US Information Agency

Crystal, David. 1987. *The Cambridge Encyclopedia of Language*, Cambridge: Cambridge University Press

Jacobson, Roman, 1966. On Linguistic Aspects of Translation: *On Translation*, New York: Oxford Univesity Press

Verma, S.K. and Krishnaswamy N. 1997. *Modern Linguistics*: An Introduction, New Delhi: Oxford University Press

Wynne-Davies, Marion. 1990. *Introduction: Guide to English Literature*, New York: Prentice Hall

জীনাত ইমতিয়াজ আলী